ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ এবং আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

ভালি রেজা নাসর

বর্তমানে পশ্চিমের অ্যাটলাস পর্বতমালা থেকে প্রাচ্যের মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার মরূভূমি থেকে মধ্য এশিয়ার সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চাশের অধিক মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে যেমন ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো বিশ্বের কিছু জনবহুল দেশ অন্তর্ভুক্ত, আবার মালদ্বীপ এবং কমোরোসের মতো কিছু অল্প জনসংখ্যার দেশও রয়েছে। কিছু কিছু দেশ শক্তিশালী ও সেখানে কার্যকর একটি সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মতো কিছু দেশ প্রতিনিয়ত নিজেদের অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। মালি এবং বাংলাদেশের মতো দরিদ্র রাষ্ট্রও যেমন রয়েছে আবার লিবিয়া, ব্রুনাই, তুর্কমেনিস্তান এবং সৌদি আরবের মতো প্রাকৃতিক সম্পদে প্রাচুর্যময় দেশও রয়েছে। তবুও মালয়েশিয়া, যেটি ১৯৯৭ সালে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছিল, তাদের সম্পদের উৎস ছিলো সফল শিল্পায়ন। কিছু মুসলিম রাষ্ট্র জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যহীন; অন্যদের মধ্যে আবার জাতি, ভাষা, বা ধর্মীয় দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিদ্যমান। সামাজিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক মতামতের প্রায় সব বৈচিত্র্যই এই রাষ্ট্রগুলোতে উপস্থিত। ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র থেকে আরব বিশ্ব বা ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া (যেখানে প্রদেশগুলিতে রাজতন্ত্র শাসন চালায়) ও আরব বিশ্বের রাজতন্ত্র এবং ব্রুনাই থেকে তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় মতো গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক আদর্শ ও সরকার পরিচালনায় ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে।

এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতিতে কিছু সাদৃশ্যও বিদ্যমান। ইসলাম তন্মধ্যে সর্বাধিক সুস্পষ্ট, এবং তা কেবল একটি ধর্ম বা বিশ্বাস হিসাবে নয়, বরং একটি আত্ম-পরিচয়ের উৎস এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে হাজির। ইসলাম দীর্ঘকাল ধরেই মুসলিম রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সাব সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যকে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি সংগ্রামের লড়াইয়ে ইসলাম ভূমিকা পালন করেছে। ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী যোদ্ধা, চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক নেতারা মুসলমানদের রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উপনিবেশবাদ থেকে মুসলিম দেশগুলোর মুক্তিকে ইসলামী আন্দোলন হিসেবেই তুলে ধরা হয়, যেমন, ১৮২৬ সালে ভারতে সৈয়দ আহমেদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) উত্থান থেকে ইরানে মির্জা হাসান সিরাজীর (১৮১৫-১৮৯৪) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং শাইখ ফাজলুল্লাহ নুরী (১৮৪৩-১৯০৯) বা মধ্য এশিয়ার ইমাম শামিল (১৭৯৬-১৮৭১), আলজেরিয়ার আমির আব্দুল কাদের (১৮০৩-৮৩), সোমালিল্যান্ডের মুহাম্মদ ইবনে আবদিল হাসান (১৮৬৪-১৯২০), সুদানের মাহদি (মৃত্যু ১৮৮৫), ইরানের জামাল আল-দ্বীন আল-আফগানি (১৮৩৮-৮৭), বা ১৭৮০ ও ১৮৮০-এর দশকে পশ্চিম আফ্রিকায় তিজানি জিহাদ (উসমান দান ফোদিও [১৭৫৪ – ১৮১৭] এর সোকোটো খিলাফত এবং আল-হাজ্ব উমার আল ফাতা টোরোর বিদ্রোহ [১৭৯৪-১৮৬৪])। অন্যান্য "ইসলামী" আন্দোলনগুলির মধ্যে মালয়দের হিজবুল ইসলাম (ইসলামিক পার্টি), ভারতের জমিয়ত-ই উলামা-ই হিন্দ (উলামা পার্টি), ১৯২০ এর দশকে ইরানের শিয়া উলেমা, লিবিয়ার সানুসিয়াহ (উমর মুখতার পরিচালিত, ১৮৫৮-১৯৩১) কিংবা মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড অন্তর্ভুক্ত। ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন ইসলামী বুদ্ধিজীবি যাদের সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে রয়েছেন মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮), আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) এবং ভারতের ও ভারতভাগ পরবর্তী পাকিস্তানের মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭) এবং মাওলানা আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-৭৯) প্রমুখ। এসব আন্দোলন এবং আন্দোলনের চিন্তাবিদগণ ঔপনিবেশবিরোধী

আন্দোলনে স্থানীয়দের নিয়ে সংগঠিত করার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। তারা ঔপনিবেশিকতা বিরোধিতাকে জিহাদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন, ইসলামের মুক্তি সংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন যা আজও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগ্রামের পথে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, যেমন সাম্প্রতিককালে ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ এবং ১৯৯৬ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচনিয়ার মুক্তিযুদ্ধে তা ভূমিকা রেখেছে। এই ইসলামী আন্দোলনগুলো পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী জাগরণের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় মাসজুমি আন্দোলন (মজলিস সিয়োরো মুসলিমিন ইন্দোনেশিয়া, মুসলমানদের পরামর্শমূলক বা শুরা কাউন্সিল) ইন্দোনেশিয়ার উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এবং ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র গঠনের শুরুর দিকে ভূমিকা রেখেছিল।

পরবর্তীতে; ইসলাম ঐসব রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে প্রভাবিত করেছে, এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইসলামী আন্দোলন সেসব রাজনীতির প্রকৃতিকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে এবং রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি জানিয়েছে। চলমান রাজনীতিতে ইসলামের গুরুত্ব, বিশেষত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর প্রাসঙ্গিকতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র গঠন এবং ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশ পরবর্তী যুগের সাথে এর সম্পর্ক জটিল এবং মাঝে মাঝে সমস্যাপূর্ণ হয়েছে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই দেখা যায় তা হলো, রাষ্ট্রগুলি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং তাদের সমাজের অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এভাবে, এসব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐতিহ্যগত ধারা, সাংস্কৃতিক আবহ এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের পথে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো রয়েছে তার সাদৃশ্য রয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের সামনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ভিন্নভাবে মোকাবিলা করে, ঠিক যেমন আকার, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থানও তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারা এনেছে।

উপনিবেশবাদের ইতিহাস মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন পরীক্ষার মিলগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের মতো জাতিগত পরিচয়, সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি এবং অন্যান্য আদিবাসী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো যেমন মুসলিম বিশ্বের মিলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে, তেমনি বিপরীতে অর্থনীতি, মতাদর্শ এবং নেতৃত্ব এসব দেশের অমিলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে। উপনিবেশবাদও মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগঠনের যে অভিজ্ঞতা তার মিল ও অমিলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে। ব্রিটিশ ও ফরাসিরা আফ্রিকা, এশিয়া এবং আরব অঞ্চলের বিরাট অংশ শাসন করেছে। ডাচ শাসিত অঞ্চলগুলি বর্তমানের ইন্দোনেশিয়ায়, অবস্থিত। আর জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এবং রাশিয়ানরা পূর্ব আফ্রিকা, ফিলিপাইন, মালায়া (এখন মালয়েশিয়া নামে পরিচিত), ককেশাস অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার মুসলমান অঞ্চলগুলি দখল করেছিল। পশ্চিম তীর ও গাজা স্ট্রিপে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণ মুসলিম ভূখণ্ডের শেষ ও একমাত্র চলমান ঔপনিবেশিক সম্পর্ক হিসেবে দেখা যেতে পারে। যদিও উপনিবেশবাদের সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়েই এই সকল অঞ্চলগুলো শাসন করা হয়েছে, তথাপি ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের ঔপনিবেশিক লক্ষ্যগুলো কিভাবে অর্জন করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতা ও প্রভাব খাটিয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যেমনি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি নিজস্বতাও রয়েছে এবং তার শিকড় তাদের ইতিহাস, বিশেষ করে সেই ঔপনিবেশিক অঞ্চলের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এই অধ্যায়ে বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম রাজ্যের উন্নয়নের সাথে ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কীভাবে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার ফলে প্রায় একই ধরণের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, আবার ঔপনিবেশিকতার সাথে প্রতিটি রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতাগুলির কারণে তাদের উন্নয়নে কীভাবে পার্থক্যও ঘটেছে তারও বর্ণনা এসেছে। ঔপনিবেশিক সময়কাল ছিল এক শতাব্দীরও কম, অথচ তা সেইসব শাসিত অঞ্চলের ভূগোল, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক এবং রাজনীতির সব দিকই চিরতরে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের বিনির্মাণ: ঔপনিবেশিকতা ও রাষ্ট্রীয় সীমানা

মুসলিম অঞ্চলসমূহে ঔপনিবেশিকতার পত্তন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উত্থান, ভারতজয় এবং আফ্রিকায় বিভক্তির মধ্য দিয়ে। এর শেষ পর্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আরব অঞ্চলসমূহের বিভক্তির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ব্রিটেন এবং ততপরবর্তী ফ্রান্স তাদের অধিকাংশ ঔপনিবেশিক অঞ্চল থেকে দখল প্রত্যাহার করে নেয় তখন ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হয়ে যায়। ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পুরোদমে গঠিত হতে শুরু করে; অবশ্য কিছু রাষ্ট্র যেমন ইরান বা আফগানিস্তান সবসময়ই স্বাধীন ছিল, যদিও তা নামমাত্রেই। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যেমন ঔপনিবেশিক ক্ষমতাশীলদের সাথে আলাপ-মিমাংসার মধ্য দিয়ে হয়েছে যেমন মালয়, ভারত ও পারস্য উপসাগরীয় উপকূল অঞ্চলগুলোতে; আবার নৃশংস ও রক্তাক্ত স্বাধীনতার যুদ্ধও ঘটেছে, যেমন আলজেরিয়ায়। পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিবেশে ইউরোপীয়

শক্তি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রত্যাহারের ঘটনায় কিছুটা আকস্মিকতাও ছিল। ১৯৫৩ সালে ইরান এবং ১৯৫৬ সালে মিশরে ঔপনিবেশিকতা পুনরায় আবির্ভাব ঘটে, যা মুসলমানদের উপর ইউরোপীয়দের সরাসরি শাসনের ধীরগতিসম্পন্ন অথচ কার্যকরী বিদায়কেই চিহ্নিত করে।

১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকা থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চল উপনিবেশবাদ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বা স্বাধীন অ-মুসলিম রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে গড়ে উঠে। তথাপি, ঔপনিবেশিবাদের ইতিহাস তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সমাজের গঠন ও পুনঃগঠন করতে থাকে। ঔপনিবেশিকতার প্রভাব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বলয় ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে যা বামপন্থী তাত্ত্বিকরা ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। নতুন রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রীয় আদর্শ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও ঔপনিবেশিকতার ছাপ নানারূপে টিকে থাকে। ঔপনিবেশিকতার প্রভাব সহজে বিস্তার না করতে দিতে চাইলেও তার পরিব্যাপ্তি ছিল অনেক বিস্তৃত। নতুন রাষ্ট্র যে অতীত থেকে নিজেদের দুরে সরিয়ে আনতে চেয়েছে এবং তাদের বর্তমান যে স্বাধীন অস্তিত্ব- এটি এ দুয়ের মধ্যে ইতিহাসের এক ধারাবাহিকতা।

> মুসলিম বিশ্ব আজ কিছু জাতি-রাষ্ট্রের সমষ্টি। যদিও ইসলামি ঐক্য মুসলিম বিশ্বজুড়ে রাজনীতিকে প্রাণবন্ত করে তুলছে ও বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের মূল দাবীও এটি, কিন্তু জাতিসংঘের আদলে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসির সীমিত গন্ডীর বাইরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্যের কোন বিস্তৃতি নেই। সীমানাভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা মুসলিম বিশ্বের জন্য তুলনামূলকভাবে নতুন। আধুনিকপূর্ব যুগে মুসলমানরা তাদের মধ্যে জাতি, ভাষা ও অঞ্চলগত পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিল, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তারা প্রথমে খিলাফত ও পরে সাম্রাজ্য ও সুলতানাতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তাদের পরিবর্তিত সীমানা বর্তমানের জাতি-রাষ্ট্রগুলির সীমানাকে বুঝাতো না, বরং শাসকদের রিটকে প্রতিনিধিত্ব করত যেসব শাসকরা ইসলামের নামেই শাসন করত। জাতীয়তাবাদের ধারণার মতো মুসলমানদের সীমানা নির্ধারিত রাষ্ট্র, পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত। মুসলিম রাজনীতিতে সীমানাভিত্তিক রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রকৃত সীমানা উভয়টিই উপনিবেশবাদের ফসল।

এর অর্থ এই নয় যে, উপনিবেশবাদের আগমনের পূর্বে মুসলিম বিশ্বে জাতিগত সংহতি এবং জাতীয়তাভিত্তিক পরিচিতির ধারণা অনুপস্থিত ছিল। এই ধরণের অনুভূতিগুলো সবসময় শক্তিশালীই ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইরানিরা প্রথম থেকেই নিজেদেরকে আরব ও তুর্কিদের থেকে আলাদা হিসেবে দেখতো এবং শিয়াবাদ ইরানে অনেকভাবে নিজেদের জাতীয় পরিচয়ের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছিলো, যা তাদের চারপাশের সুন্নি তুর্কি, আরব ও তুর্কমেনিয়ানদের থেকে ইরানীদের আলাদা করে। আরব এবং বেদুইন, আরব ও তুর্কী, বা মালায় ও জাভানিসদের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান আছে। জাতিগত জাতীয়তাবাদ এবং একটি জাতিরাষ্ট্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ধারণা এবং ঔপনিবেশিক যুগেই তার সৃষ্টি হয়েছে। তখনই রাজনৈতিক পরিচিতির ধারণা হিসেবে জাতীয়তাবাদ মূখ্য হয়ে উঠেছিল এবং মুসলিম রাজনৈতিক চেতনায় এর শেকড় গেড়েছিল এবং এর অংশ হয়ে উঠেছিল যা ইসলামিক পরিচয়কেও সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়ে যায় এবং পশ্চিমাদের আদলে এটি রাষ্ট্রীয় সীমানায় আবদ্ধ হয়।

এজন্য জাতীয়তাবাদি রাজনৈতিক আদর্শকে ঘিরে নির্মিত জাতিরাষ্ট্রের ধারণা যা তুলনামুলকভাবে সাম্প্রতিক এবং ইসলামের উম্মাহ্র ধারণা যা মুসলিম রাজনৈতিক আদর্শকে সমর্থন দেয়- এই দুয়ের মাঝে মুসলিম বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। উম্মাহর ধারণা শুধু মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধই করে না, বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক অঙ্গীকারের চেয়ে ইসলামকে প্রাধান্য দেয়। রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের মধ্যে এই সমস্যাটির তীব্রতা রাষ্ট্র কতটুকু ইসলামী চেতনাকে গ্রহন করতে ইচ্ছুক তার উপর নির্ভর করে। যেখানে সৌদি আরব, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া জাতীয়তা এবং উম্মাহর ধারণার মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে চেয়েছ সেখানে তুরস্ক, পাহলভি ইরান, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবিকে সচেতনভাবে উম্মাহর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। এখানে জাতীয়তাবাদের চেতনা কতটা শক্তিশালী সেটিও গুরত্বপূর্ণ। তুরস্ক, ইরান এবং মিশরের মতো শক্ত জাতীয়তাবাদের চেতনাসমৃদ্ধ দেশগুলো জোরালোভাবে তার বিশেষাধিকারগুলি তুলে ধরেছে, যেমনটা মালয়েশিয়া বা নাইজেরিয়ার মতো বিশাল সংখ্যালঘুদের দেশগুলোতেও রয়েছে। বিপরীতদিকে, পাকিস্তানের মতো দুর্বল জাতীয় চেতনার অঞ্চলগুলিতে উম্মাহর আদর্শ প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছে।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা লাভ করেছিল যার সীমানা উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। তারা মোটাদাগে রাষ্ট্রগুলি

যেভাবে জন্ম নিয়েছিল সে ভৌগলিক আকার এবং রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে স্বতন্ত্র্য সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে তা মেনে নিয়েছিল। যদিও সীমানার সম্প্রসারণ ঘটেছে: যেমন মরোক্কো কর্তৃক পশ্চিম সাহারা, ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক পূর্ব তিমুর, তুরস্ক কর্তৃক উত্তর সাইপ্রাস দাবি ও ৭০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইরানের বাহরাইন, সিরিয়ার লেবানন এবং ইরাকের কুয়েত দাবির মত কিছু উদাহরণ রয়েছে। এই দাবিগুলি সামনে আনা হয়েছে জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের নামে। এগুলো সঙ্গায়িত হয়েছে ও বৈধতাও পেয়েছে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত ইসলামিক সাম্রাজ্য বা মুসলিম বিশ্বের অঞ্চলসমূহের বিভক্তিকে বা নতুন সীমানা নির্ধারণ করার নিয়মগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো সামগ্রিকভাবে চ্যালেঞ্জ করেনি। মুসলিম দেশগুলি উম্মাহ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেনি, বরং কেবল জাতিরাষ্ট্রের সীমানা প্রসারিত করতে চেয়েছে। ঐসব সীমান্তের বাস্তবতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, যদিও সীমান্তের পরিধি নিয়ে মাঝে মাঝে আপত্তি এসেছে।

এই সাধারণ নিয়মের শুধুমাত্র ব্যতিক্রম আরব জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামিজমের আদর্শ। ৬০ এর দশকে আরব জাতীয়তাবাদ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় রাজনৈতিক আদর্শ ছিল এবং তারপর থেকেই এটি একটি সাধারণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা আরব বিশ্বকে বিভক্ত করে ২২ টি রাজ্যে পরিণত করার বিষয়টি নিয়ে নৈতিকভাবে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এমনকি এই ক্ষেত্রেও, ঐক্যের এই শ্লোগান কয়েকটি সিম্বলিক একত্রীকরণ চুক্তি ব্যতীত (যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক যা ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত মিশর ও সিরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারটি এবং আরব লীগ গঠন) সেগুলো ঔপনিবেশিক সীমানার বিভক্তিকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। শুধু উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন সফলভাবে একতাবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তা ইসলামের নামে নয় বরং ইয়েমেনী জাতীয়তাবাদের নামে। এমনকি ইংল্যান্ড কর্তৃক খামখেয়ালীভাবে সৃষ্ট জর্ডান রাষ্ট্র যার প্রথম রাজা আমির আব্দুল্লাহকে নির্দিষ্ট অনুদান ও ছয়মাস সময় দেওয়া হয়েছিল পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে এই ধারণাটি কাজ করে কিনা, সময়ের পরীক্ষায় সেটাও সফল হয়েছিলো। এছাড়াও আরব জাতীয়তাবাদ কোন ইসলামী মতাদর্শ নয় এবং এই অর্থে এটি বিভক্ত মুসলিম বিশ্বকে পরিবর্তন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে না; বরং এটি বিভক্ত আরব বিশ্বের ব্যাপারে কাজ করে। ইসলামী আন্দোলনগুলোও জাতিগত পরিচয়ের উর্ধে উঠে সকল মুসলিমদের ঐক্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং জাতিরাষ্ট্রের পরিবর্তে উম্মাহ্‌র বাস্তবতাকে গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, ইসলামী আন্দোলনগুলো মুসলিম বিশ্বের সীমানার বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখেই তাদের রাজনীতি পরিচালনা করেছে। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার ইসলামিক পার্টি (জামায়াত-ই-ইসলামী), নাইজেরিয়া, সেনেগাল থেকে সুদান, মিশর, সিরিয়া, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মুসলিম ব্রাদারহুড তাই একে অপরের থেকে স্বতন্ত্।

যদি এবং যখন রাষ্ট্রীয় সীমানার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়া হয়, এটি রাষ্ট্রীয় কোন সংকটের সমাধানের অভাবে হয় না, বরং অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রের দখলদারী মনোভাবের কারণে অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিবেশীকে পরাভূত করার কারণেই হয়। বাইরের সহায়তার কারণে কুয়েত স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে, কিন্তু সবার ভাগ্যে তা ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ, মরোক্কোর সাথে পশ্চিম সাহারা আর ইন্দোনেশিয়ার সাথে পূর্ব তিমুর জোরপূর্বক একত্র করা হয়েছিল। সত্তর এর দশকে ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পারস্য উপসাগরে কয়েকটি ছোট দ্বীপের দখল নেয়। আমিরাত দ্বীপপুঞ্জগুলো ফেরত নেয়ার দাবি অব্যাহত রেখেছে, এবং পোলিসারিও আন্দোলনের নেতৃত্বে মরোক্কো থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলমান আছে, পশ্চিম সাহারার স্বাধীনতার ইস্যুটিও আজও চাঙ্গা।

এর ফলস্বরূপ, মুসলিম অঞ্চলের উপনিবেশিক ভাগ, নীতিগতভাবে এবং যেকারণে সেগুলো প্রাথমিকভাবে শুরু করা হয়েছিল তা পরবর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়ও মেনে নেয়া হয়েছে। যদিও এখানে ঔপনিবেশিকতার ধারা উত্তেজনাপূর্ণ ছিল না বলা যাবে না। প্রথমত, অনেক বিভক্তিই ছিল সমস্যাপূর্ণ। কোন কোন বিভক্তি শুধু স্থানীয় ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের কথা বিবেচনা করে করা হয়েছিল, জনগণ ও সম্পদের উপর তার প্রভাব কি হবে সে কথা চিন্তা করা হয়নি। অন্য বিভক্তিগুলো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর নিজেদের মধ্যকার কূটনৈতিক উত্তেজনা দূর করার জন্য করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকরা ইউরোপীয় মিত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা দখলদার মনোভাবের রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বাফার হিসাবে কাজ করার জন্য উপনিবেশগুলি তৈরি করা হয়েছে। উসমানী খেলাফতকে ভাঙ্গার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইতালি, এবং গ্রীসকে শান্ত করার জন্য করা হয়েছিল। অন্যদিকে ভারতকে রাশিয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আফগানিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৯৮ সালের পর ফ্রান্সের ব্যাপারে একই ধরনের উদ্বেগের কারণে মিশর দখল করে ব্রিটেন, যার ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। কৌশলগত সিদ্ধান্ত এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ অবশেষে নতুন ঔপনিবেশিক অঞ্চল সৃষ্টি করে, যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। পারস্য উপসাগরীয় তেলের ব্যাপারে ব্রিটিশ স্বার্থের কারণে কুয়েতের সৃষ্টি হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরানের খুজাস্তান প্রদেশ থেকে "আরবিস্থান" তৈরির অনুরূপ একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়। কয়েক দশক পরে, একইরকম অর্থনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে ব্রিটেন ব্রুনাইকে মালয়েশিয়ায় যোগ না দিতে উৎসাহিত করে। স্থানীয় রাজনৈতিক বিবেচনাগুলি আরও বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয়। ফ্রান্স সিরিয়ার ভেতর থেকে লেবানন সৃষ্টি

করে একটা খ্রিস্টান-আরব রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে; এবং আমির আব্দুল্লাহকে সমর্থন দিতে ব্রিটেন গঠন করে জর্ডান, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যার পরিবার উসমানীয় সাম্রাজ্যের আরব ভূমিগুলোকে ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে বিভক্ত করার ফলে প্রতারিতবোধ করত।

উপনিবেশবাদ আসলে কীভাবে কাজ করেছে এবং এর ছাপ কি ছিল তা মুসলমানদের নিজেদের পরিচয়ের ধারণা ও রাজনীতির ধারণাকে নির্মাণ করেছে এবং বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা লাভের পর ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত করেছে। শুরুর দিকে, ঔপনিবেশিক শাসকরা যে উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে ইউরোপীয় ভাষায় প্রশিক্ষিত করেছিল তাদের মাধ্যমে এবং সরকার গঠনের বিভিন্ন উপায়গুলোর মাধ্যমে মুসলিম অঞ্চলসমূহের বিভক্তিগুলো ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। তাদের মগজ যখন উচ্চবিত্তরা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল এবং তাদের সামনে সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠল, তখন সীমান্ত সৃষ্টির ব্যাপারে দৃঢ়তা সৃষ্টি হলো। বিদ্যমান জাতিগত পরিচয়গুলিকে ঘিরেই এই দৃঢ়তা গড়ে উঠে ও জাতীয়তাবাদের ভিশন তৈরী হয় যা ঐ সীমানাগুলিকে আরও বেশি অর্থবহ করে তোলে। একজন সরকারী আমলা কুয়ালালামপুরে বা দামেস্কের "মালয়শীয়" বা "সিরিয়" চিন্তার প্রতি নিজের স্বার্থের কারণের আগ্রহ প্রকাশ করে যাতে বৃহত্তর মালয় বা আরব সত্তার প্রেক্ষিতে তার ক্ষমতা প্রাদেশিক অফিসারের মত সীমিত না থাকে। এটা এমন এক অনুভূতি ছিল যে পরবর্তীকালে ১৯৫৮-৬১ সালের মিশরীয়-সিরীয় ঐক্য চুক্তিও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ইরাকি ও সিরিয়ান আমলাতান্ত্রিকরা, যারা উসমানী খিলাফতের অধীনে একই পরিশীলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে কাজ করত, তারা তখন বিভিন্ন ইউরোপীয় ঐতিহ্য ও ভাষাগুলির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলল যা তাদের "বিচ্ছিন্নতা"কে চূড়ান্ত করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এইভাবে সার্বজনীন বৈশ্বিক একাত্বতার বদলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই শক্তিশালী করে তুলছিলো। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এবং নয়া এলিটদের জন্য যে কাজের ক্ষেত্র এটি সৃষ্টি করেছিল, পরিশেষে সেগুলোই রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে যার অস্তিত্ব আগে ছিল না।

মালয় বিশ্বে এই প্রক্রিয়াটি মালয়েশিয়ান এবং ইন্দোনেশিয়ান পরিচয়ের মধ্যে এবং মুসলিম মালয় ও অমুসলিম মালয় পরিচয়ের মধ্যেও দুরত্ব সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ মালায়া এবং ডাচ ইন্ডিজের আমলা এবং রাজনীতিবিদরা নিজ নিজ ব্রিটিশ ও ডাচ দখলকৃত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভিন্নতাগুলোকে তাদের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মালয় অংশ, অথবা থাইল্যান্ডের একটি মুসলিম-পাত্তানি অঞ্চল এবং ফিলিপাইনের মিন্দানাওকে ঘিরে এবং উভয়ের অমুসলিম ও অমালয় অংশকে বাদ দিয়ে একটি মালয় অঞ্চলের সম্ভাবনা একটি অকার্যকর ধারণায় পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিকতার সীমানা এবং ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যা এর ফলে সৃষ্ট তা ভবিষ্যত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ নির্ধারণ করে। একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী মালয় আবির্ভূত হয়নি কারণ এর লোকেরা বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত ছিল। অন্যদিকে, বোর্নিও এবং অল্প সময়ের জন্য সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার অংশ হয়েছিল কারণ এরা সবাই একই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন দ্বারা শাসিত হয়েছে। ঔপনিবেশিকতা এইভাবে স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য ধারণার বিপরীতে রাষ্ট্রসমূহের সীমানা এবং এদের বাস্তবতাকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে।

নতুন রাষ্ট্রগুলো প্রায়শ বিদ্যমান জাতিতাত্ত্বিক পরিচিতি বা সাদৃশ্য যেমন ইরাকী বা সিরিয় ইত্যাদি পরিচিতিকে আত্মীকরণ করে। আবার অনেক সময় নতুন জাতীয়তা আবিষ্কার করে, যেমন জর্দান ও মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে যা হয়েছে। এটা করার উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদী আদর্শের সৃষ্টি করা যা রাষ্ট্র গঠনকে শক্তিশালী করবে। এই প্রক্রিয়াটি প্রতিযোগী সংখ্যালঘুদের জাতিগত পরিচয় চাপা দেয় এবং সেগুলোকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উন্নীত হতে বাধা দেয়। ইরান, ইরাক ও তুরস্ক কুর্দি পরিচয়টি জাতীয়াতাবাদে পরিণত হতে যেন না পারে তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ইরান কুর্দিদেরকে ইরানী পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে, তুরস্ক তাদেরকে মাউন্টেন তুর্কি" হিসাবে চিত্রিত করেছে। রাষ্ট্র গঠন নিয়ে পরীক্ষাগুলোর সফলতা নির্ভর করেছে জাতীয় চেতনার বিকাশ কতটুকু সফল ছিল তার উপর। এটি আবার জাতীয়তাবাদ গঠনের ভিত্তি জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের শক্তির ওপর নির্ভরশীল। সময়ের সাথে সাথে জাতিগত ও সীমানার সংজ্ঞায়নই জাতীয় পরিচিতি গঠনের সীমারেখা তৈরি করে, তারা শিকড় বিস্তার করে এবং ইতিহাস জুড়ে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্বের স্মৃতিকে ছাপিয়ে ধর্মনিরেপেক্ষ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিক শক্তি সম্ভবত আঞ্চলিক সীমানা যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে তা চায়নি, কিন্তু বাস্তবে এই সীমানাগুলোই ভবিষ্যত রাষ্ট্র গঠনের সাথে এটে গেছে ।

ভৌগোলিক বিভাজনগুলোও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে যারা একই অঞ্চলের একচেটিয়া অধিকার দাবি করে। উদাহরণস্বরূপ, জর্ডান ও সিরিয়া, স্বাধীনতার শুরুর দিকে বৃহৎ সিরিয়া পুনর্গঠন করার দিকে উভয়েই নজর দেয়। জর্ডান আবার প্যালেস্টাইন এবং মরোক্কো অন্যদিকে মৌরিতানিয়া এবং আলজেরিয়ার কিছু অংশের দাবি অব্যাহত রেখেছিল। সিরিয়া ও তুরস্ক আলেকজান্দ্রেট্টার (ইস্কান্দারুন) সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই করেছে; ইরান ও ইরাক শাত আল আরব চ্যানেলের ওপর; মিশর ও সুদান নীল নদীর পানির উপর; পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ডুরান্ড লাইনের উপর; কাশ্মীরের উপরে পাকিস্তান ও

ভারত; সৌদি আরব ও কাতার এবং সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সীমান্তের মরুদ্যান ও তেল ক্ষেত্রের উপর; লিবিয়া ও চাদ তাদের সীমান্ত অঞ্চলে এবং ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তুনব ও আবু মুসা দ্বীপের উপর তাদের অধিকার দাবী করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রতিবেশীদের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, কারণ তারা মুসলিম রাষ্ট্রকে উপনিবেশবাদের এক কৃত্রিম সৃষ্টি হিসেবে দেখেছে। লেবাননের প্রতি সিরিয়ার দাবি, ব্রুনাইর প্রতি মালয়েশিয়ার, (সাম্প্রতিক পর্যন্ত), কুয়েতের প্রতি ইরাকের এবং পশ্চিম সাহারার প্রতি মরোক্কোর দাবী এর উদাহরণ। সীমানা রাষ্ট্রগুলির আকৃতি দিয়েছে বটে তবে তাদের কার্যকারিতার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। যদিও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সীমানা বেঁধে দিয়েছিল কিন্তু সেই সীমানাগুলির মধ্য বসবাসরত মানুষের মধ্য একটি জাতীয় সংস্কৃতির অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেনি বললেই চলে। প্রায়শ তারা এর ঠিক এর উল্টোটাই করেছিল; বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্মীয় বা উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইত। মুসলিম ভূখণ্ডের আঞ্চলিক বিভক্তিকে তাই কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি বরং তা জাতীয় বিভ্রান্তি ও ভবিষ্যত জাতীয় সমাজের ভাঙ্গনের জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

একই রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু একই জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ না হওয়া জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের মধ্যে অমিমাংসিত সমস্যা রাষ্ট্রের সীমানাগুলির প্রতি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। লেবাননের কনফেশনাল উত্তেজনা; নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়াতে জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘর্ষ; এবং ইরান, ইরাক এবং তুরস্কে কুর্দিদের দুরবস্থা ঔপনিবেশিক শক্তিদের অংকিত সীমানার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ফলে সৃষ্ট সমস্যার উদাহরণ। তবুও, এই সমস্যাগুলির মধ্যে কোনটিই "ইসলামের" পুর্নজাগরণ করার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ নয়। বরং, মুসলিম রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্যে জাতীয়তাবাদের এতটাই প্রাবল্য যে পাকিস্তান রাষ্ট্র ইসলামের নামে তৈরি করা হয়েছিল, তা ১৯৭১ সালে আবার জাতিগতভাবে বিভক্ত হয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দুই রাষ্ট্রে। যদিও সমস্যায় আচ্ছন্ন, তবুও আঞ্চলিক ধারণা এবং মুসলিম রাষ্ট্রের বাস্তবতা আজও উপনিবেশিক ছাঁচেই অব্যাহত আছে।

[এই প্রবন্ধটি জন এসপসিটো সম্পাদিত The Oxford History of Islam এর একটি বুক চ্যাপ্টার এর অংশবিশেষ। আগ্রহী পাঠকগণ সম্পূর্ণ লেখাটি পড়তে চাইলে ঐ গ্রন্থটিতে ভ্যালি নাসের এর লেখা চ্যাপ্টারটি দেখতে পারেন। - সম্পাদক]

সূত্রঃ European Colonialism and the Emergence of Modern Muslim States

ভালি রেজা নাসর

[illegible] (SAIS) [illegible] Fletcher School of Law and Diplomacy-[illegible] The Shia Revival (Norton, 2007), The Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power (Oxford University Press, 2001); Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (Oxford University Press, 1996); The Vanguard of the Islamic Revolution (University of California Press, 1994)[illegible] Oxford Dictionary of Islam (Oxford University Press, 2003) [illegible] Expectation of the Millennium: Shi`ism in History (SUNY Press, 1989) [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] Tufts University [illegible], [illegible] Fletcher School of Law and Diplomacy [illegible] Massachusetts Institute of Technology (MIT) [illegible]